না যাইয়ো যমের দুয়ার

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ)

সংকলন ও সম্পাদনা

তন্ময় ভট্টাচার্য

না যাইয়ো যমের দুয়ার

(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ)

তন্ময় ভট্টাচার্য

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

তবুও প্রয়াস

www.tobuoproyas.com

NA JAIYO JOMER DUYAR

A Book of Culture & Tradition

by Tanmoy Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২১

পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব তন্ময় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদের ছবি নৃত্যলাল দত্ত, দত্ত প্রেস (উনবিংশ শতাব্দী)

প্রচ্ছদ রূপায়ণ আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

অলংকরণ জাতিস্মর

বিশেষ কৃতজ্ঞতা নিলাদ্রী শেখর বালা, লিপিঘর.কম

তবুও প্রয়াস প্রকাশনী কর্তৃক

১৯/২ রাধানাথ মল্লিক লেন (দ্বিতল)

কলকাতা— ৭০০ ০১২ থেকে প্রকাশিত

মোবাইল: ৮৬৪১৯৩৭৩৫৬, ৯৮৩৬৯২৯৫৮০

ই-মেল: tobuoproyasprokashoni@gmail.com

অক্ষর বিন্যাস আক্ষরিক, মানকুণ্ডু, হুগলি— ৭১২ ১৩৯

মুদ্রণ এস এস এন্টারপ্রাইজ, ২এ মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট

কলকাতা ৭০০ ০৫৪

দাম: ২৭৫.০০

... আর, যে-আঙুল একদিন মধুপর্কে ডুব দিত, ঘি-চন্দন তুলে আনত তোমার জন্য, ছুঁতে চেয়ে চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছ। পাশের ঘরে জড়ো হচ্ছে ধান-দূর্বা। একটা প্রদীপ, আপনা থেকেই জ্বলে উঠল। উলু দিল কেউ। আসনে গিয়ে বসলে। মাথা ঠেকালে পায়ে। মেঝেয় ঠুকে গেল কপাল। আছে অথচ নেই— এই রহস্য ভাল্লাগছে না। উঠোনে তখন কেটে-ফেলা গাছ একের পর এক ভিড় করেছে। তাদের সমস্ত আয়ু দিয়ে যেতে চাইছে তোমাকে। পাতাও। ছিঁড়ে নিলে। ঘরে এনে, ছুঁইয়ে নিলে কপালে। যেন কেউ দূর থেকে পাঠিয়েছে; জালিকায় জমে থাকা ধুলোই বাঁচিয়ে দেবে মৃত্যুর হাত থেকে। হেসে উঠলে। উড়িয়ে দেওয়ার আগে, প্রত্যেকটা পাতায় ছিদ্র এঁকে দিলে তুমি। সেও বুঝুক, শূন্যতা কখন আশীর্বাদ হয়ে ওঠে। বুঝুক, দায়ী করা ছাড়া একটা আঙুলও আর তোমাকে ছোঁয় না আজকাল...

সূচিপত্র

ভূমিকা

পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা মধুর ডাক কী? মা। পৃথিবীতে সর্বোত্তম সম্পর্ক কী? মা এবং সন্তানের। তেমনিই, বর্তমান লেখকের মতে স্বর্গীয় মাধুর্যমণ্ডিত সম্পর্ক হল ভাই-বোনের। এই সম্পর্কের গভীরে সমাজতাত্ত্বিক হয়তো অন্যবিধ কারণের সন্ধান করবেন, তা তিনি করুন, কিন্তু সংসারে, পারিবারিক জীবনে ভাই-বোনের মতো মধুর সম্পর্ক অদ্বিতীয়। ভাই-বোন যদি পিঠোপিঠি হয়, তবে তো কথাই নেই। সেক্ষেত্রে দুজনের সম্পর্ক দাঁড়ায় হরিহরআত্মার। একে অপরের খেলার সঙ্গী, আত্মার দোসর, একে অন্যের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেয়। আর যদি বোন বড়ো হয় অর্থাৎ দিদি, তাহলে ছোটো ভাইটিকে দেখভালের অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তার ওপর। এক ধরনের অপত্য স্নেহ উৎসারিত হয় ছোটো ভাইয়ের প্রতি দিদির। দিদি আর ছোটো ভাইয়ের অনবদ্য সম্পর্ক চিত্রিত রয়েছে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালীতে, অপু ও দুর্গার মাধ্যমে। ভাইবোনের সম্পর্কের প্রেক্ষিতে অপু-দুর্গা আইকনের ভূমিকায়। একের জন্য অপরের যে মায়া, মমতা, ভালোবাসা, দায়বদ্ধতা কিংবা দুশ্চিন্তা বাস্তবিকই সংসারে তার তুলনা মেলা ভার।

বর্তমান লেখকের কাছে মধুর মতো সুমিষ্ট ও স্নিগ্ধ লোকাচার কিংবা ব্রত যাই বলি না কেন, হল ভাইদ্বিতীয়া, পরিশীলিত ভাষায় 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া'। তন্ময় ভট্টাচার্য বহু পরিশ্রম করে ভাইদ্বিতীয়া নিয়ে একটি গোটা বই লিখেছেন। নামকরণ করা হয়েছে 'না যাইয়ো যমের দুয়ার'। লেখক-সংকলক-সম্পাদক দাবি জানিয়েছেন 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গালা

গ্রন্থ'-এর। তাঁর দাবিকে সোৎসাহে সমর্থন জানাচ্ছি এবং এমন একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়ার জন্য আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি।

লেখক আলোচ্য গ্রন্থটিকে তিনটি সুচিন্তিত পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন— কথামুখ, সংকলন এবং পরিশিষ্ট। কথামুখ পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ভাইফোঁটার উৎসমুখ, ভাইফোঁটার শাস্ত্রাচার ও লোকাচারগত দিক, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাইফোঁটার উপস্থিতি অথবা অনুসৃতি, ভাইফোঁটা-কেন্দ্রিক মেলা ইত্যাদি। সংকলন পর্যায়ে সন্নিবিষ্ট হয়েছে মন্ত্র, গান, ছড়া, লোককথা-প্রসঙ্গ। এবং পরিশিষ্টে যুক্ত হয়েছে পদ্মপুরাণ এবং ভবিষ্যপুরাণ উল্লিখিত ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিধি, তৎসহ কবিশেখর কালিদাস রায়ের একটি অনবদ্য সুখপাঠ্য কবিতা এবং তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

ভাইফোঁটার ছড়ায় 'যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা' উচ্চারিত হয়। কেন যম-যমুনার উল্লেখ? ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সুক্তে যম এবং যমী ভাইবোন হিসাবে উপস্থাপিত। এখানে উল্লেখ্য, যমী ভাইকে যৌন সম্পর্কে যুক্ত করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু যম এই আহ্বানে সাড়া দেননি। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য 'সহোদরা অগম্যা'। পরিণতিতে দেখি ভগিনী যমকে তাঁর মঙ্গলকামনায় ফোঁটা দিচ্ছেন। অনেকেই মনে করেন, এর থেকেই নাকি ভাইফোঁটার উৎপত্তি!

আমরা জানি, ট্যাবু-টোটেমের অনুসৃতির পূর্ববর্তীতে যথেচ্ছ যৌনাচারের চল ছিল। এমনকি মায়ের সঙ্গে পুত্রের কিংবা পিতার সঙ্গে কন্যার যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হত। তখন নির্বিকারে যৌনসম্ভোগ হত। এই যথেচ্ছ যৌনাচারের নিবৃত্তি ঘটল একই টোটেমের অন্তর্ভুক্ত নারী পুরুষের যৌনাচারে নিষেধাজ্ঞা বা ট্যাবুর মাধ্যমে। ভাই-বোন পরিবারে একত্রে মানুষ হয়। ফলে, অনেক সময় উভয়ের সান্নিধ্যসুখ ভোগের সুযোগ। এই সুযোগে উভয়ের মধ্যে যৌনসম্পর্ক যাতে গড়ে না ওঠে তারই জন্য প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ কিংবা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ভাইফোঁটার সুচিন্তিত প্রবর্তন। ঋগ্বেদের আখ্যানেও তারই আভাস। যম ভগিনীর আহ্বানে সাড়া

দেননি ট্যাবুর কারণে। অনেক লোককথাতে পাচ্ছি, ভাই অথবা ভায়েরা বোনের মাংস ভক্ষণ করেছে। কিংবা লোভাতুর ভাইয়ের নাগাল থেকে রক্ষা পেতে বোন যথাসাধ্য সচেষ্ট হয়েছে।

ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ইত্যাদিতে ভাইদ্বিতীয়ার প্রসঙ্গ উল্লিখিত। এগুলিতে বলা হয়েছে তাম্বুলসহ ভাইকে আরাধনার কথা; আরও বলা হয়েছে এই আচার অনুষ্ঠিত না হলে পরিণতির কথা। বোন সেক্ষেত্রে বৈধব্যের স্বীকার হবে অন্যদিকে ভাইয়েরও আয়ুক্ষয়ের সম্ভাবনা। অর্থাৎ উভয়েরই ক্ষতি। ভাইদ্বিতীয়ার অপরিহার্য অঙ্গ ভোজন। কিন্তু ফোঁটার কথা অনুল্লিখিত থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, এসব পুরাণে ভাইদ্বিতীয়ার পরিবর্তে 'যমদ্বিতীয়া' শব্দবন্ধ উচ্চারিত।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উল্লেখ মিলেছে রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্বে', সময় ষোড়শ শতাব্দী। কিন্তু রঘুনন্দনের কৃত্যতত্ত্বের পূর্ব থেকেই ভাইফোঁটার চল। রঘুনন্দন বিধান দিয়েছিলেন যমপূজার, কিন্তু তিলক বা ফোঁটা দেওয়া প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন।

ভাইফোঁটা-কেন্দ্রিক আরো কয়েকটি কিংবদন্তি রয়েছে। যেমন নরকাসুর বধের পর কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলে বোন সুভদ্রা তাঁকে ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলেন। অথবা বলিরাজ বিষ্ণুকে বন্দি করেন পাতালে, লক্ষ্মী বলিরাজকে ভাই পাতিয়ে তাঁকে ফোঁটা দেন এবং মুক্ত করেন বিষ্ণুকে। এমন কথাও কেউ কেউ বলেন, নন্দীবর্ধন অনুসূয়ার উপাখ্যান অনুসারে রাজা নন্দীবর্ধনকে তাঁর বোন আদরপূর্বক ভোজনে আপ্যায়িত করেন, সেই থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রচলন।

কড়ে আঙুলের সাহায্যে যে বোন ভাইকে ফোঁটা দেন, লেখক তার কারণ ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়েছেন, তবে তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন সঙ্গত ভাবেই— 'জৈনদের ভাইকে তিলক দান, বৌদ্ধ তথা পরিবর্তিত হিন্দুদের টীকা পার্বন, যম-যমুনার পুরাণকথন ও শাস্ত্রীয় তিলকবিধি সব মিলেমিশে একাকার হয়েই জন্ম নিয়েছে ভাইফোঁটার লোকাচার?'

ভাইফোঁটা একান্তভাবেই বাঙালি হিন্দুর এক সাংস্কৃতিক পরম্পরা, কিন্তু তাই বলে ভাইফোঁটার পরিচিতি বঙ্গেতর ভারতে অপরিচিত এমন নয়। সংকলয়িতার সবিশেষ কৃতিত্ব তিনি বাংলাদেশের ১৩টি জেলার ২৬টি ভাইফোঁটার ছড়া সংকলন করে দিয়েছেন। তবে যতই ভাইফোঁটার সংস্কৃত মন্ত্রের প্রচলন থাক, 'ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা' এই বাংলা ভাষায় রচিত ছড়াটির প্রচলন অনেক পূর্ববর্তী কালের। দীর্ঘদিন আমাদের ধারণা ছিল 'বারমাস্যা'র প্রচলন সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই, কিন্তু এক বিদেশিয় গবেষক গুসান জাভেটিল প্রমাণ করে দিয়েছেন লৌকিক বারমাস্যা থেকেই বরং সংস্কৃতে এর অন্তর্ভুক্তি। একই কথা ভাইফোঁটার ছড়া প্রসঙ্গে।

সবশেষে, ভাইফোঁটা ঐতিহ্য ও পরম্পরা নির্ভর একটি স্নিগ্ধ লোকাচার। মননসঞ্জাত এই লোকাচারটিতে হৃদয়ের উষ্ণ স্পর্শও লভ্য। আবারও বর্তমান গ্রন্থের সংকলয়িতা তথা সম্পাদককে হার্দিক অভিনন্দন। তাঁর আন্তরিক প্রয়াস সঞ্জাত এমন একটি গ্রন্থের কারণে।

ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ বরুণকুমার চক্রবর্তী

কথামুখ

শিরোনামে এমন গম্ভীর শব্দ দেখে প্রথমেই পালাতে ইচ্ছে করে। ভাইফোঁটার মতো এক সহজ ও অনাড়ম্বর লোকাচার নিয়ে লেখাও যদি এতই 'ভূমিকাসুলভ' হয়, তাহলে তো সমস্ত চেষ্টাই মাটি! বরং অন্যভাবে ভাবি। শিরোনাম দিতে হয় বলে দেওয়া। সবদিক দেখেশুনে, এই ঢাল ব্যবহারই নিরাপদ মনে হল। ফোঁটার মতো। একবার কপালে এসে জুটলে, যমেরও সাধ্য নেই ছোঁয়ার।

কিন্তু এতকিছু থাকতে হঠাৎ ভাইফোঁটা নিয়ে কেন? যে রীতি স্বাভাবিকভাবেই ফিরে-ফিরে আসে প্রতিবছর, তাতে বিশেষত্ব খোঁজার কারণ কী? আদৌ কি বিশেষত্ব রয়েছে কিছু? ভেবে দেখতে গেলে, বচ্ছরকার এই আচার আমায় কৌতূহলী করেছিল মন্ত্রের জন্য। অবশ্য ছড়াও বলা চলে। তবে মন্ত্র যে কেবল সংস্কৃতেরই হতে পারে, এ-কথা বিশ্বাস করি না আমি। শুভকামনার জন্য যা-কিছু উচ্চারিত, তা-ই আমার কাছে মন্ত্র। শ্লোক।

কাজের কথায় আসি। যেটা প্রচলিত মন্ত্র, কমবেশি সকলেরই জানা। বিশেষত বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগই এই মন্ত্রের সঙ্গেই পরিচিত। পঞ্জিকাতেও 'ভাতৃদ্বিতীয়ায় প্রচলিত বাংলা প্রবচন' বলে সেই চেনা মন্ত্রেরই উল্লেখ—

ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

যমুনা দেন যমকে ফোঁটা
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।

এই চার লাইনই সাধারণভাবে সর্বত্র শোনা যায়। প্রমিত বাংলায় ভাইফোঁটার মন্ত্রের মূল কাঠামো এটাই। পরবর্তী দু-লাইন অবশ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাল্টে-পাল্টে গেছে। কোথাও—

যম যেমন হন চিরজীবী
আমার ভাই যেন হয় তেমন চিরজীবী।

কোথাও আবার—

যমুনার হাতে ফোঁটা খেয়ে যম হল অমর।
আমার হাতে ফোঁটা খেয়ে ভাই হোক অমর।

তাও না হয় বোঝা গেল। কিন্তু এতেই শেষ? পাশাপাশি, ফোঁটা দেওয়ার সময়ের আচারও আছে বৈকি! জল দিয়ে কপাল মুছিয়ে দেওয়া, মন্ত্র পড়তে পড়তে বাঁ-হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে তিনবার ঘি-চন্দন-কাজল মেশানো ফোঁটা দেওয়া, ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করা, প্রদীপের ওম মাথায় ছুঁইয়ে দেওয়া— এ-সবই ভেসে এসেছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। যাবতীয় আচার ও আনন্দ মিলেমিশেই হাজির হয় দিনটি। একত্রিত হন পরিবারের সদস্যরা।

আর যাঁদের ফোঁটা দেওয়ার কেউ নেই? হ্যাঁ, এ-বই তাঁদেরও। তাঁদের মনখারাপের বন্ধু হয়ে উঠুক এই বই। যেমন আমিও, খোঁজের মধ্যে দিয়েই ফিরে পেতে চাইছি শৈশব-কৈশোরের মায়াময় দিনগুলোকে।

না যাইয়ো যমের দুয়ার
(ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ)
তন্ময় ভট্টাচার্য
কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত